দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ড. এম এ মাননান

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিস্থিতি কিছু প্রসঙ্গ কিছু অনুষঙ্গ

শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা দোষের কেন? শিক্ষকরা রাজনীতিমনস্ক ছিলেন বলেই বাংলাদেশের ইতিহাস বদলেছে; বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে; অনাচার-অত্যাচারের হাত থেকে দেশবাসী বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। রাজনীতি এখানে সমস্যা সৃষ্টি করছে না। সমস্যার মূলে রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের অযোগ্যতা ঢাকার লক্ষ্যে অপরাজনীতির আশ্রয় নিয়ে স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা

গত কয়েক দিন ধরে পত্রিকার পাতায় আর ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি, কড়া সমালোচনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার। ঘটনাটি দলীয় সভায় শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের হাতাহাতি। কেউ বলছেন, স্তম্ভিত হওয়ার মতো ঘটনা; কেউ বলছেন ন্যক্কারজনক, 'নোংরামির চূড়ান্ত রূপ'; আবার কেউ বলছেন, নোংরা দলাদলি ও রেষারেষি। ঘটনাটি হাতাহাতি আর মৃদু মারামারির। সারা দেশে এত হাতাহাতির ঘটনা ঘটে—তা নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটিকে নিয়ে এত শোরগোল কেন? কারণ আছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সাধারণ মানুষের হাতাহাতি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতাহাতি একেবারেই এক বিষয় নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ বছরের শিক্ষকতা আর ৬ বছরের ছাত্রজীবনে এমনটি আমি কখনো দেখিওনি, শুনিও নি। তবে প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল ১৯৮৯ সনের এক বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায়। একটি বিষয়ের উপর আলোচনা-পর্বে পাশাপাশি বসা দুই জন সিনিয়র শিক্ষকের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অন্য জনের নাকের ডগার কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে 'দিব কিন্তু একটা' এমনটি বলে চিৎকার করে হুঙ্কার দিচ্ছিলেন। আমি কাছাকাছি একটি চেয়ারে তখন সভাপতির অনুমতিক্রমে সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সভা পরিচালনা করছিলাম। অবস্থা দেখে ত্বরিত উঠে এসে উত্তেজিত হাতটি ভদ্রভাবে ধরে বসিয়ে দিয়েছিলাম। অনেক সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেন নি। ব্যাপারটা আলোচনা করে আমরা সেখানেই মিটমাট করে দিয়েছিলাম। তিন মেয়াদে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে কিংবা এর পর আর কখনো এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি।

উল্লিখিত দু'জন শিক্ষকই পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ছোটখাটো মনোমালিন্য হতেই পারে। একে বড় রূপ দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। অথচ এখন কেন এত অধৈর্য? এত অসহিষ্ণুতা? এ ব্যাপারে সিনিয়র শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে একটি দৈনিক পত্রিকার মন্তব্য এরূপ: "প্রধানত ছয়টি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ শিক্ষক রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে প্রভোষ্ট পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, বাসা বরাদ্দ, নিজের অথবা অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগ এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেয়া"। এ মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া কঠিন, আবার দ্বিমত পোষণ করাও কঠিন।

রাজনীতিকে এখানে দোষারোপ করা হচ্ছে। শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা দোষের কেন? শিক্ষকরা রাজনীতিমনস্ক ছিলেন বলেই বাংলাদেশের ইতিহাস বদলেছে; বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে; অনাচার-অত্যাচারের হাত থেকে দেশবাসী বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। রাজনীতি এখানে সমস্যা সৃষ্টি করছে না। সমস্যার মূলে রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের অযোগ্যতা ঢাকার লক্ষ্যে অপরাজনীতির আশ্রয় নিয়ে স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা। যারা ক্যাম্পাসে অপরাজনীতি করে বেড়ায় তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে দেখলে দেখা যাবে, দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে, আলোকিত জায়গায় তারা বড় হয়নি, অধীত বিদ্যা তাদের হৃদয়ের ময়লা ঘোচাতে পারেনি। সর্বোপরি, তারা শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে নেননি। ভালো, নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি হলো শিক্ষকতা, তাই রেজাল্টের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েছেন। খুঁটে খুঁটে দেখলে আরো দেখা যাবে, তারা হয়ত কেউ কেউ 'প্রফেসর' হয়ে গিয়েছেন কিন্তু নিজে এককভাবে একটি প্রবন্ধও লিখে প্রকাশ করতে পারেননি। গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করা তো বহু দূরের কথা। অনেকে কোনো গবেষণা না করেই আপগ্রেডেশন-এর বদৌলতে উচ্চতর পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। নামকা ওয়াস্তে কিছু প্রবন্ধে অন্যদের নামের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে দিয়েছেন-এক প্রবন্ধে বহু জনের নাম। এমন প্রবন্ধও আছে যা লিখতে একজনই যথেষ্ট, সেখানে রয়েছে চার-পাঁচ জনের নাম রচয়িতা হিসেবে। কোয়ালিটির কথা বাদই দিলাম। কোয়ালিটির বিষয়টি দেখার কোনো সিস্টেমিক পন্থাতো নেই-ই; এমনকি এ ব্যাপারে কারো কোনো গরজও নেই। প্রশাসনের যাদের দেখার কথা, তারা থাকেন নন-একাডেমিক কাজে বেশি ব্যস্ত। চিন্তা-ভাবনার সময় কোথায়? কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত ভিজিটর নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তিনি কখন একাডেমিক উন্নয়নের চিন্তা করবেন? দিনের বেলায় যদি তিনি বিভিন্ন বিভাগের/ইনস্টিটিউটের হরেক রকমের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে কেবল মাল্য বরণ করতে থাকেন কিংবা বাইরের জগতে অপ্রয়োজনীয় সভা-সেমিনার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির কথা ভাববেন? যদি তিনি প্রত্যেক দিন না হলেও অন্তত সপ্তাহে দুই/তিন দিন ক্যাম্পাস ঘুরে না দেখেন, যাকে ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলা হয় 'ম্যানেজমেন্ট বাই ওয়াকিং এরাউন্ড', তা হলে তিনি কীভাবে বুঝবেন কোথায় কী হচ্ছে, কোথায় কী প্রয়োজন, ক্যাম্পাসের কোথায় অবৈধ কাজকর্ম হচ্ছে, কোথায় গাঁজার আসর বসছে, কোথায় আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে স্বাস্থ্য-সমস্যার সৃষ্টি করছে, ক্যাম্পাসের কোথায় সৌন্দর্য বর্ধন প্রয়োজন, কোন্ বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সময়মতো অফিসে আসছেন না অথবা এসেও অন্যত্র সময় দিচ্ছেন কিংবা কারা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে লাউঞ্জে বসে আড্ডা মারছেন। সময় কোথায় তাঁর শিক্ষার্থীদের মনের কথা শোনার? তারা কী চায়, কী তাদের সমস্যা, সামাজিক চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে কোথায়, কীভাবে এসবের সমাধান করা যায়, আরো কত কী!

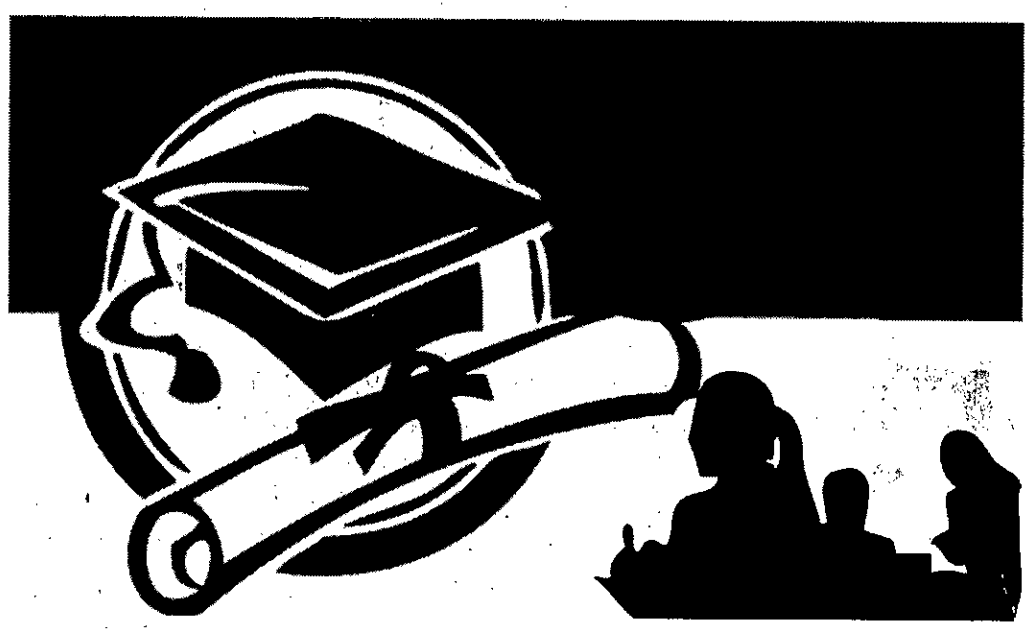

প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তি হবেন একজন সত্যিকারের মাঠকর্মী। তিনি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসবেন, তাতে সমস্যা নেই। ফাইল ওয়ার্কতো করবেনই। কিন্তু তার কর্ম-জগৎ এর বাইরেও বিশালাকারে বিস্তৃত। সেই বিশালতাকে বোঝা খুব জরুরি। কেউ এটিকে আমার উপদেশ বলে মনে করবেন না, আশা করি। এটিই বাস্তবতা, সমাজেরও প্রত্যাশা। প্রশাসক এবং শিক্ষক সকলেরই রাজনীতি হবে শিক্ষার্থীর জন্য কল্যাণমুখী। এমনটি হলে কেউ শিক্ষক রাজনীতির দিকে আঙুল তুলে কথা বলবে না। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ১৯৮১-৮৩ পর্যন্ত গবেষক-শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সেখানকার শিক্ষকরা কর্মরত অবস্থাতেই এমপি হতে পারেন, রাজনীতি চর্চা করতে পারেন। আমার একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বন্ধু, লোকসভার সদস্য ছিলেন। শিক্ষক রাজনীতি সেখানেও আছে কিন্তু তা কলুষিত হয়নি। শিক্ষার্থীরা জানেই না কোন শিক্ষক কোন দলের। যা হয় নীরবে হয়। দোষ যদি কিছু হয় তা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য হয়, রাজনীতি সে জন্য দায়ী নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুস্থ রাজনীতিকে ধারণ করেই কীভাবে শিক্ষার্থী-বান্ধব শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করা যায়, সে সম্পর্কে কিছু করণীয় রয়েছে। আমার ভাবনা এখানে তুলে ধরলাম: ক) ঢাকাসহ মোট চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের 'বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ' অনুযায়ী চলে আর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে নিজ নিজ আইন অনুযায়ী। সবাই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। সব আইনেই উপাচার্যদের অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইন সংস্কারের মাধ্যমে এই ক্ষমতার রাশ টানা দরকার। আইনে প্রো-উপাচার্যদের প্রায় ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। উপাচার্য ইচ্ছা করলে কিছু কাজের দায়িত্ব দেন; না দিলে তাদের কিছুই করার থাকে না। এটিও সুপ্ত ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খ) সাধারণভাবে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নীতিমালা সনাতনী। একমাত্র উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুধু মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে কি একজন শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব? একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সার্বিক দায়িত্বের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের থাকতে হবে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বাচনভঙ্গী, স্যাবলীল ভাষার প্রয়োগে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার দক্ষতা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, উভয় ভাষায় শুদ্ধ করে লেখার যোগ্যতা, গবেষণা করার মন-মানসিকতা, ক্লাসরুমে সঠিক শিক্ষা-শিখন পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর দখল, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার কৌশল-জ্ঞান এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দেবার মতো বিষয়বস্তু-ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা। রেজাল্ট ভালো হলেই শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায় না। তাই সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করতে হলে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া এবং ক্লাস ডিমোনস্ট্রেশন জরুরি। এগুলোতে যোগ্য মনে হলে শিক্ষকতার এপ্টিটিউড টেস্ট করাও প্রয়োজন। আর মৌখিক পরীক্ষায় ৫/১০-এর বেশি নম্বর থাকা ঠিক নয়। বেশি নম্বর থাকা মানে অনিয়মের সুযোগ করে দেওয়া।

গ) আপগ্রেডেশন সিস্টেম খুবই ভালো উদ্দেশ্যে করা হলেও এর অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। উল্লিখিত শর্তাবলী ঠিকঠাকভাবে পালন করা হলে সমস্যা কখনো হতো না। শর্ত মানা হয়, তবে এর মধ্যে থাকে অনেক কাহিনি। 'বর্তমান' পদে কত বছর সক্রিয় কাজের অভিজ্ঞতা দরকার তা নির্ধারিত আছে কিন্তু বাস্তবে অনেক রকমের 'রিবেট' দিয়ে সময়কাল-এর শর্ত পূরণ করে দেওয়া হয়। ফলে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হওয়ার আগেই একজন শিক্ষক উপরের পদে চলে যাচ্ছেন। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে 'একসেপ্টেন্স লেটার' জমা দিয়েও প্রকাশনার শর্ত পূরণ করা হয়। এটি কোনো ভাবেই কাম্য হতে পারে না।

ঘ) শিক্ষকদের রচিত পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের মান মূল্যায়নের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি করা প্রয়োজন। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

ঙ) ভিসি নিয়োগে সার্চ কমিটির কথা বহুবার বলা হলেও এ ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। সার্চ কমিটি থাকা জরুরি হয়ে পড়েছে। কমিটি শিক্ষাগত নৈপুণ্য ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে ৫/৬ জনের নাম সুপারিশ করবে, তাদের মধ্য থেকে সিনেট সদস্যগণ নিয়মানুযায়ী তিন জনকে মনোনয়ন দিবেন। এ তালিকা থেকে চ্যান্সেলর একজনকে নিয়োগ দিবেন। এতে অভ্যন্তরীণ টানাটানি অনেকটা কমবে।

চ) ১৯৭৩-এর আদেশে কিছুটা পরিমার্জন করে নির্বাচনের সংখ্যা কমিয়ে আনা দরকার। বিশেষ করে ডিন নির্বাচন বন্ধ করে ফ্যাকাল্টির শিক্ষকদের মধ্য থেকে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ডিন নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং ভালো ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

ছ) আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, কোনো প্রকার সম্ভাব্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করেই নতুন বিভাগ/ইনস্টিটিউট খোলা। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে বিগত বছরগুলোতে নতুন বিভাগ খোলার হিড়িক পড়ে গেছে। নতুন বিভাগ খোলা নিয়েও প্রায় সময় ভিতরকার রাজনীতি গরম হয়ে ওঠে। সম্ভাব্যতা যাচাই ব্যতীত নতুন বিভাগ খোলার রীতি বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই।

জ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। মনোজাগতিক উন্নয়নে নিজকে নিয়োজিত করার সুযোগ পেলে বেহুদা কাজের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহ কমে যাবে।

ঝ) শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এ জন্য আলাদা বিশেষায়িত ট্রেনিং একাডেমি স্থাপন করা যেতে পারে।

ঞ) শিক্ষকদেরকে আরো বেশি প্রফেশনাল কাজে 'এনগেজ' করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এটি সহজে করা সম্ভব। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এলএমএস) চালু করে প্রত্যেক শিক্ষককে স্ব-স্ব ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

সর্বশেষে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আজ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতাহাতি হয়েছে, কাল হবে ঠ্যাঙাঠ্যাঙি। তারপর? তারপর আর তেমন কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু এক টুকরো সর্বনাশ। কামনা করি, হোক আমাদের বিবেকের জাগরণ; বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হোক মুক্তবুদ্ধি আর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু।

● লেখক : উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়